কোস্ট ট্রাস্ট, তারিখ ১২ জানুয়ারি ২০২০ **খসড়া অবস্থান পত্র**

জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল উপকূলীয় বাঁধ ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা

১. জলবায়ু পরিবর্তন ও বিপদাপন্ন বাংলাদেশ

বাংলাদেশ নদীর মোহনায় গঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এদেশে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা, মৌসুমী বন্যা, নদীভাঙন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, খরা ও অসময়ে বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা বেশি। **অধিকন্তু, এই ভূ-খন্ড এশিয়ার বৃষ্টিবহুল এলাকা দ্বারা পরিবেষ্ঠিত এবং এ দেশের ৬০ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে মাত্র ৫ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। হ্যাডলি সেন্টার ফর ক্লাইমেট প্রিডিকশন এন্ড রিসার্চ (HCCPR) এর প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৮০ সালে ৪০ সেন্টিমিটার (১৫ ইঞ্চি) বৃদ্ধি পাবে (Streatfiel, 2008) যা এ দেশের প্রতিবেশের জন্য একটি বড় ঝুঁকি। জার্মানভিত্তিক গবেষণা সংস্থা জার্মানওয়াচ এর Global Climate Risk Index -2019 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে সপ্তম।** সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র (SMRC) কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০৩০ এবং ২০৭০ সালে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সমীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বর্ষায় অতিবৃষ্টিজনিত কারণে বন্যা এবং শুষ্ক মৌসুমে খরা পরিলক্ষিত হবে। **আইপিসিসির এর প্রাক্কলনে দেখানো হয়েছে যে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তার ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ হারাবে। (Planetizen 2008; The Independent, 2008). বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে দেশের উপকূলবর্তী এলাকা সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC) এর ৫ম সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২৭ মিলিয়ন।** অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (IDMC) এর হিসাব মতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০০৪ থেকে ২০০৮ সালের মধ্য বাংলাদেশের প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এর ফলে বাস্তুচ্যুতির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান যা দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সৃষ্টি করবে।

২. বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ঝুঁকিসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উপকূলীয় জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫% উপকূলে বসবাস করে এবং সরকারী হিসাব মতেই অতি বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ২০ মিলিয়ন যা ক্রমবর্ধমান। **জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, খরা ও লবণাক্ততা এর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে এবং এর আর্থ-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতিও আমাদের কাছে দৃশ্যমান। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশে ২৩৪টি বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানা সহ ও প্রায় ০২ লক্ষ প্রানহানীর ঘটনা ঘটেছে। শুধুমাত্র ২০০৭ সালে সংগঠিত ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে তৎকালীন সময়ে তিন বিলিয়ন ডলার বা আমাদের জিডিপি'র ৩% সম্পদের ক্ষতি হয়েছিল, যা এখনও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই, ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলার কারণে উপকূলীয় এলাকায় বেড়িবাঁধসমূহের যে ক্ষতি হয়েছে তা আজ পর্যন্ত পুনর্নির্মাণ বা মেরামত করা সম্ভব হয় নাই।** ক্রমাগত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অত্র এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করার পাশাপাশি তাদেরকে বাস্তুচ্যুত করছে। গত ৩৫ বছরে লবণাক্ততার পরিমাণ ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় প্রতি বছর ৩.৫-৪.৫ শতাংশ লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে (Soil Resources Development Institution-SRDI)। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের ৭৫ শতাংশ বিলিন হয়ে যাওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। খরা মৌসুমে উজানের পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে লবণ পানি প্রায় ২৪০ কিঃ মিঃ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে যার ফলে লবনাক্ত এলাকা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে কৃষিক উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং দেশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে বাস্তুচ্যুতির জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ঢাকা, চট্টগ্রামের মত বৃহত্তর শহরগুলোতে বাস্তুচ্যুত মানুষ মাইগ্রেশন করছে।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং অভিযোজন অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় জলবায়ু অবাকাঠামোর উপর বিশেষ গুরুত্বরোপ করা হয়েছে । বিশেষ করে বাঁধ, সাইক্লোন সেল্টার, পানি ব্যবস্থাপনা, বন্যা সেল্টার, শহরের পানি নিষ্কাশনের বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে প্রায় ৪৫ মিলিয়ন লোক বাস করে যার মধ্যে অর্ধেকের বেশি মানুষ অধিক ঝুঁকির মধ্যে জীবন যাপন করছে। বাঁধগুলা উপকূলীয় জনগনের নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে। তাই অবকাঠামোগুলোর মধ্যে বাঁধকে আমরা (First Line Protection Infrastructure) হিসেবে বিবেচনা করি। সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্নিঝড়, বন্যা, নদীভাঙনের, লবনাক্ততার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে এই বেড়িবাঁধগুলো নিরাপত্তা প্রদান করছে। জীবন জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি এবং সম্পদের ক্ষতিকে প্রশমন করছে। তাই সরকারকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও

ব্যবস্থাপনাকে দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং সেই অনুয়ায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বাংলাদেশের উপকূলীয় বাঁধগুলোর বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ৬০'এর দশকে বেড়িবাঁধসমূহ তৈরী হয়েছিল মূলত সাগরের জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা কৃষি জমিসসমূহ রক্ষা করা এবং কৃষি বিল্পব সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে। যে কারণে বাঁধের উচ্চতা সাগরের সাধারণ জোয়ার ধারাকে মাথায় রেখেই ঠিক করা হয় এবং সে অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে সময়ের বিবর্তনে বর্তমানে এসকল বাধেঁর অধিকাংশই বিগত ছয় দশকে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এবং উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে। **বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে বাংলাদেশের মোট বেড়িবাঁধের দৈর্ঘ্য ১৬,২৬১ কিলোমিটার যার মধ্যে উপকূলীয় মোট ১১৭টি উপকূলীয় বেড়িবাঁধের দৈর্ঘ্য ৫৭৫৭ কিলোমিটার। এসকল বাধঁ সময়মত ও পরিকল্পনা মাফিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারন ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলোচ্ছ্বাস এসকল বাধেঁর ক্ষয়ক্ষতি আরও বৃদ্ধি করছে। ফলে জনগণের জীবন-সম্পদের ঝুকিঁও বৃদ্ধি পাচ্ছে।** চিংড়ি চাষের কারণেও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাঁধ। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে উপকূলীয় এলাকায় ২০৫০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা দাড়াতে পারে প্রায় ৬০ মিলিয়ন। তাই উপকূলীয় এলাকাকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে উপকূলীয় বেড়িবাঁধগুলো মেরামত করার পাশাপাশি উচ্চতা বাড়ানো প্রয়োজন। **বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করতে উপকূলীয় বেড়িবাঁধগুলোর উচ্চতা আরও ১৫-২০ ফুট বাড়াতে হবে।**

৫. পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ ব্যবস্থাপনা কতটুকু জনগণের চাহিদা পূরণ করছে ?

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যার ফলে দেশের জানমাল ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়। এরই প্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রগের নেতৃত্বে ক্রগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপয়ার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদ উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালের অডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং-৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে স্বতন্ত্র একটি সংস্থার সৃষ্টি করা হয়। **সুতরাং এখানে স্পষ্টত যে, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ৬০'এর দশকে বেড়িবাঁধসমূহ তৈরী হয়েছিল মূলত বন্যা, সাগরের জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা কৃষি জমিসমুহ রক্ষা করা এবং কৃষি বিল্পব সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে। যে কারণে বাঁধের উচ্চতা সাগরের সাধারণ জোয়া ধারাকে মাথায় রেখেই ঠিক করা হয় এবং সে অনুসারে নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে সময়ের বিবর্তনে বর্তমানে এসকল বাধেঁর অধিকাংশই বিগত ছয় দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে।** এটা আরো স্পষ্টত যে, বেড়িবাঁধগুলো নির্মাণের সময় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টা মাথায় ছিলো না। কিন্তু আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাই গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা (Inensity) এবং সংখ্যা (Frequency) বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও প্রাণহানির পরিমান কমলেও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এমতাবস্থায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমে কিংবা এর দায়িত্বে সময়েত প্রয়োজনে পর্যাপ্ত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। গতানুগতিক পদ্ধতিতেই তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে **। বাঁধ নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে থেকে কতটুক জনগনের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছে সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। তাছাড়া নামে জন অংশগ্রহণের কথা থাকলেও সে ব্যাপারে আমরা কোন সুস্পস্ট নীতিমালা বা কৌশল দেখতে পাই না।** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জনগণের চাহিদা মোতাবেক কাজ করতে পারছে কিনা সেই প্রশ্ন থেকেই যায়?

৬. সরকারের প্রতিশ্রুতি ও বাজেট বরাদ্দ

এটা সত্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এর দায়িত্বে সম্প্রসারিত হলে তার আর্থিক সক্ষমতা এবং জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গত দশ বছরের বাজেট পর্যবেক্ষণ করে দেয়া যায় যে, যে পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাঁধ ব্যবস্থা করতে হলে কি পরিমাণ অর্থ দরকার, কোথা থেকে সে অর্থ আসবে সেই ব্যাপারগুলো সুনির্দিষ্ট না । এক্ষেত্রে আমাদের বাঁধ নির্মানের ক্ষেত্রে দাতা নির্ভরশীলতা দূর করতে হবে। আমরা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে অভিযোজন কর্মসূচিত গুরুত্ব স্বীকার করি কিন্তু বাধঁসমুহের উন্নয়নের জন্য উপকূলীয় এলাকায় প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না দিয়ে তা বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি'র মত প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। **উপকূলীয় এলাকায় বাধঁ নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০ চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৯৩২.৪৫ কোটি টাকা। এখানে উল্লেখ্য যে পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের সকল এলাকায় (উপকূলীয় এবং অ-উপকূলীয় এলাকা) বাঁধ নির্মানের**

জন্য দায়ীত্ব প্রাপ্ত এবং সেক্ষেত্রে ২৩৭১ কোটি টাকা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধুমাত্র উপকূল এলাকায় প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষনের জন্য যদি পাঁচ বছর মেয়াদী পরকিল্পনা নেওয়া হয় তাহলেও সরকারকে প্রতি বছর কমপক্ষে ১৫,০০০-১৬,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা উচিৎ। তারা মনে করেন বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই পরিমাণ বিনিয়োগে সরকারের যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে এবং সরকারকে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। সরকার সেটা না করে দাতাদের পরামর্শ শুনছেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে দাতারা অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি কিন্তু তাদের স্বার্থ (?) নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার অর্থায়ন করছে না। যে কারনে উপকূলীয় এলাকার সুরক্ষায় সময়মত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

৭. জনঅংশগ্রহণ বাঁধ ব্যবস্থাপনা খরচ কমায় এবং স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করে ঃ কুতুবদিয়া ও ভোলার কেস স্ট্যাডি

ক. কুতুবদিয়ায় জোয়ারের পানি ঠেকাতে স্বেচ্ছাশ্রমে অংশগ্রহণমূলক বেড়িবাঁধ

কক্সবাজারের কুতুবদিয়া দীপ দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে দ্বীপের বিশাল অংশ সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেছে। অনেকের বসতবাড়ি সাগরের বিলীন হওয়ায় অন্যত্র বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। ভাঙা বেড়িবাঁধগুলো সংস্কার বা মেরামতের অভাবে উদ্বিগ্নতায় দিন কাটাচ্ছে দ্বীপের প্রায় দেড় লাখ মানুষ। ভাঙা বেড়িবাঁধ দিয়ে জোয়ারের পানিতে

প্লাবিত হয় ১৫ টির মতো গ্রাম। কক্সাবাজারের কুতুবদিয়া দ্বীপে বেড়িবাঁধের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আলী আকবর মুরালিয়া ইউনিয়ন ও আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের কুমিরাচরা অংশ। এই দুই অংশ দিয়ে নিয়মিত জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত হয়। **গত আগস্ট ২০১৯ এ কুতুবদিয়া বেড়িবাঁধের বড়ঘোপ ইউনিয়নের মুরালিয়া অংশের বেড়িবাঁধ হঠাৎ ভেঙে পড়লে স্থানীয় এলাকা জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত হয়। ঈদুল আজহার ছুটিতে দ্বীপের বাইরে থাকা তরুণরা বাড়িতে আসলে তাদেরকে কুতুবদিয়া বেড়িবাঁধের বড়ঘোপ ইউনিয়নের মুরালিয়া ভাঙা অংশে জরুরী ভিত্তিতে জোয়ারের পানি ঠেকানোর জন্য মাটি দেওয়ার কাজে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ফরিদুল ইসলাম চৌধুরী ও বড়ঘোপ ইউপির চেয়ারম্যান আ. ন. ম. শহীদ উদ্দিন ছোটন। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ঈদের পর দিন থেকে এলাকার যুব সমাজ নেমে পড়ে কাজে। এবং তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে কোস্ট ট্রাস্ট আর্থিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করে।** এর ফলশ্রুতিত্ব জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে তাৎক্ষনিকভাবে জোয়ারের পানি ঠেকানোর জন্য বাঁশের খাচা তৈরি করে তার উপর বালির বস্তা , জিও ব্যাগে বালু ভর্তি ও মাটি ভর্তি বস্তা দিয়ে কুতুবদিয়া বেড়িবাঁধের বড়ঘোপ মুরালিয়া অংশে প্রায় ৫০০ মিটার বেড়িবাঁধ মেরামত করা হয়েছে। স্বেচ্ছাশ্রমে এই কাজ শুরু করেছে বড়ঘোপ ইউনিয়নের যুবসমাজ ও সাধারণ জনগণ। **মাত্র সাড়ে পাঁচ লাখ টাকায় প্রায় ৫০০ মিটার বাঁধ পুনারায় নির্মাণ সম্ভব হয়। স্থানীয় ইউনিয়নয় পরিষদ, উপজেলা প্রশানন ও কোস্ট ট্রাস্টের সার্বিক সহযোগিতায় ব্যক্তি কমিউনিটি উদ্যোগে এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়।** এর ফলে স্থানীয় জনগণ দুর্ভোগ এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। পাশাপাশি, বাঁধ ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি মালিকালা তৈরি হয়েছে।

খ. ভোলার চরফ্যশনের টেকসই বাঁধ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (Sustainable Embankment Management Piloting Project)

স্থানীয় সরকারের (Local Goverment) টেকসই বাঁধ ব্যবস্থাপবা প্রকল্পের কথা বলতে পারি (Sustainable Embankment Management Piloting Project-SEMPP) যা ১৯৯৮-৯৯ সালে ভোলার চরফ্যাশনে পাইলটিং করা হয়েছিল। বাঁধের কান্ট্রি সাইডে স্থানীয় জনগনের পুনর্বাসিত করা হয় এবং রিভার সাইডে পুকুর রাখা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্য অনুয়ায়ী, পুনর্বাসিত জনগোষ্ঠী পুকুরে শুষ্ক মৌসুমে মাছ চাষ করবে এবং সরকারের বাঁধের দুই পাশের বনায়ন রক্ষা করবে। কোন বাঁধ ভেঙে গেলে এই কমিউনিটি তা মেরামত করবে। বাঁধ ব্যবস্থাপনায় তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। দেখা গিয়েছে, **তৎকালীন বাঁধ ব্যবস্থাপনায় প্রটি কিলোমিটারে ২৭ হাজার টাকা খরচ হলেও কমিউনিটি পর্যায়ে বাঁধ ব্যবস্থাপনায় তা খরচ পড়েছিল মাত্র দুই হাজার টাকা।সুতরাং এর ফলে বাঁধ ব্যবস্থাপনার ব্যয় হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি বাঁধগুলোকে কমিউনিটি মালিকানার (Community Ownership) বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।** এই প্রকল্পের মডেলটি তৎকালীন পানি সম্পদ মন্ত্রীর কাছে উত্থাপন করলে তিনি ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন এবং সারাদেশব্যাপী কাজ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। যদিও পরবর্তিতে তা আর আলোর মুখ দেখেনি। সরকারের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নিলে টেকসই উপকূলীয় বাঁধ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে বলে আমরা নাগরিক সমাজ মনে করি।

৮. বাঁধ ব্যবস্থাপনায় নাররিক সমাজের প্রত্যাশা

বাঁধ মেরামত নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় কী করা সে ব্যাপারে গবেষণা দরকার। তাছাড়া গতানুগতিক কাঠামোর থেকে বের হয়ে জনমুখী বাঁধ বির্মাণ ও মেরামতে ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা জানি সরকারের বদ্বীপ পরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্প সমূহের ৮০%ই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করবে। এক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ডের

কাঠামো আরো সম্পসারিত এবং জনমুখী করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়তে গুরুত্বসহকারে নিয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বর্তমানে যে পরিকল্পনা কৌশল অবলম্বন করে বাঁধ নির্মান পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে সেটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এবং সেখানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা রয়েছে। সুতরাং এসব জটিলতা এড়াতে **বাঁধ নির্মান পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ এবং তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যুক্ত করতে হবে। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে।** পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মীদের আইসিটি নলেজ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। বাঁধ নির্মানের ক্ষেত্রে চলমান কার্যক্রম বিষয়ে তথ্য প্রকাশ ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনার সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বলা থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই। **প্রতিটি প্রকল্পে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে যাতে জনগণ চাইলেই যেকোন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা বিষয়ে অভিযোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটি আরো তথ্যবহুল করা প্রয়োজন।** নদী খনন, পুরনো খাল খনন ও নতুন খাল তৈরি করে নদীর নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।পাশাপাশি নদী মোহনা এবং গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো যথাসম্ভব ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে এগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধির করার ব্যসস্থা গ্রহণ করতে হবে। বেড়িবাঁধ নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্মকর্তা কর্মচারীদের আরো বেশি আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। সর্বপরি সাধারণ জনগণের মাঝে জলবায়ু পরিবর্তন এবং বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সচেতনতা তৈরির উদ্দ্যেশ্যে বিভিন্ন সভা সেমিনার, ক্যাম্পেইন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

জলবায়ু সহনশীল টেকসই উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে নিম্ন সুপারিশসমূহ উত্থাপন করা হলোঃ

৮.১ বাঁধ পরিকল্পনা, নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন

প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিচালন এবং রক্ষণাবেণ এর সকল পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ স্থানীয় জনগণ স্থানীয় বাঁধের ধরণ, প্রয়োজনীয়তা ভালো ভাবে উপলব্ধি করতে পারে। পরিকল্পনা পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকদের অংশগ্রহণ দেখা গেলেও পরবর্তী বাঁধ নির্মান বা ব্যবস্থাপনায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না বললেই চলে। তাই তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। জেলার পর্যায়ের দপ্তরসমূহে নিয়মিত গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে। কমিউনিটি মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২ বাঁধ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষণ স্থানীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করতে হবে

বাঁধ ব্যবস্থাপনায় পানি উন্নয়ন কাছে কেন্দ্রীয়ভাবে বরাদ্দ থাকার কারণে এর প্রক্রিয়াগত কারণে বাঁধ নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনা করা হয় না। বিশেষ করে জরুরী ভিত্তিতে বাঁধ মেরামত করার প্রয়োজন হলে বাঁধ মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং স্থানীয় সরকার বিশেষ করে বিশেষ করে উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে বাঁধের ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ থাকলে তাৎক্ষনিকভাবে বাঁধ ভেঙে গেলে স্থানীয় সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারবে। এতে বাঁধ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করা সহজ হবে। পাশাপাশি জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তাদের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্টাবল থাকবে । পাশাপাশি, রিপোর্টিং এর জন্য আলাদা ম্যাকানিজম তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।

৮.৩ বাঁধ ব্যবস্থাপনায় সরকারের নিজস্ব রাজস্ব বাজেট থেকে বরাদ্দ বাড়াতে হবে

গত এক দশকে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলার ক্ষেত্রে অনেক কথা বললেও উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে বাজেটে চাহিদা অনুয়ায়ী পর্যাপ্ত টাকা বরাদ্দ দেয়নি। তথাপি, দাতা নির্ভর বাজেট শর্তাযুক্ত হওয়ায় তা সময় মতো এবং চাহিদা অনুয়াযী বাঁধ নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং সময় ও জনগণের চাহিদা অনুয়ায়ী সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে আগেই বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে অবকাঠামো খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। তবেই জলবায়ু সহনশীল টেকসই উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ সম্ভব হবে এবং উপকূলীয় জনগণের টেকসই নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

সচিবালয় ঃ কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮-০২-৫৮১৫০০৮২/ ৯১২০৩৫৮, ই মেইল: info@coastbd.net, ওয়েব: www.coastbd.net

=====